

শ্রীমদ্ভাগবত

অষ্টম স্কন্ধ
“সৃষ্টির সংবরণ”

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল
অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবাদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য
কর্তৃক

মূল সংস্কৃত শ্লোক, শব্দার্থ, অনুবাদ এবং বিশদ তাৎপর্য-সহ
ইংরেজি ŚRĪMAD BHĀGAVATAM গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ
অনুবাদক : শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী



ভক্তিবাদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, বোম্বাই, নিউ ইয়র্ক, লস এঞ্জেলস, লন্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

PTP DAS
MAYAPUR

প্রথম অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডের প্রশাসক মনুগণ

সর্বপ্রথমে আমি আমার পরমারাধ্যতম গুরুদেব কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। ১৯৩৫ সালে তিনি যখন রাধাকুণ্ডে অবস্থান করছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমি বোস্বাই থেকে সেখানে গিয়েছিলাম। তখন তিনি আমাকে মন্দির নির্মাণ এবং গ্রন্থ প্রকাশনা সম্বন্ধে বহু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে একান্তভাবে বলেছিলেন যে, মন্দির নির্মাণ থেকে গ্রন্থ প্রকাশ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর সেই উপদেশ চিরকালের জন্য আমার হৃদয়ে গাঁথা হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে আমি ব্যাক টু গড্‌হেড ছাপাতে শুরু করি, এবং ১৯৫৮ সালে যখন আমি গৃহস্থ-আশ্রম ত্যাগ করি, তখন আমি দিল্লীতে শ্রীমদ্ভাগবত ছাপাতে শুরু করি। শ্রীমদ্ভাগবতের তিনটি খণ্ড যখন ভারতে ছাপানো হয়, তখন ১৯৬৫ সালের ১৩ই অগাস্ট আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

আমি সব সময় আমার শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে গ্রন্থ প্রকাশ করার চেষ্টা করে চলেছি। এখন ১৯৭৬ সালে, শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধ পর্যন্ত ছাপানো হয়েছে এবং দশম স্কন্ধের সংক্ষিপ্তসার ইতিমধ্যেই কৃষ্ণ, দ্য সুপ্রিম্ পার্সনালিটি অব গড্‌হেড (লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ) নামক গ্রন্থ রূপে প্রকাশিত হয়েছে। এখনও অষ্টম স্কন্ধ, নবম স্কন্ধ, দশম স্কন্ধ, একাদশ স্কন্ধ এবং দ্বাদশ স্কন্ধ প্রকাশ করার কাজ বাকি রয়েছে। তাই আমি আমার গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাকে এই কার্য সম্পাদন করতে বল দেন। আমি মহাপণ্ডিত নই, মহান ভক্তও নই— আমি কেবল আমার শ্রীগুরুদেবের এক বিনীত সেবকমাত্র এবং আমি আমার সাধ্য অনুসারে এই সমস্ত গ্রন্থাবলী আমেরিকায় আমার শিষ্যদের সহযোগিতায় তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য প্রকাশ করার চেষ্টা করছি। সৌভাগ্যক্রমে পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্বৎসমাজ এই সমস্ত গ্রন্থের প্রশংসা করছেন। আসুন, আমরা সকলে মিলে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের প্রসন্নতা বিধানের জন্য আরও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করি।

অষ্টম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম এবং তামস—এই চারজন মনুর বৃত্তান্ত সংক্ষেপে প্রদান করা হয়েছে। সপ্তম স্কন্ধের শেষ পর্যন্ত স্বায়ম্ভুব মনুর বংশের বর্ণনা শ্রবণ করে পরীক্ষিৎ মহারাজ অন্যান্য মনুদের সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন পরমেশ্বর ভগবান কিভাবে, কেবল অতীতেই নয়, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও অবতরণ করেন, এবং কিভাবে তিনি মনুরূপে বিভিন্ন লীলাবিলাস করেন। যেহেতু পরীক্ষিৎ মহারাজ সেই বিষয়ে জানতে অত্যন্ত আগ্রহী হয়েছিলেন, তাই শুকদেব গোস্বামী ইতিমধ্যেই আবির্ভূত হয়েছেন যে ছয়জন মনু তাঁদের কথা বর্ণনা করার পর, অন্য সমস্ত মনুদের বৃত্তান্ত ধীরে ধীরে বর্ণনা করেছিলেন।

প্রথম মনু ছিলেন স্বায়ম্ভুব মনু। তাঁর দুই কন্যা, আকুতি এবং দেবহূতি যথাক্রমে যজ্ঞ এবং কপিল নামক দুই পুত্রসন্তান প্রসব করেন। শুকদেব গোস্বামী যেহেতু পূর্বেই তৃতীয় স্কন্ধে, কপিলদেবের কার্যকলাপ বর্ণনা করেছিলেন, তাই তিনি এখন যজ্ঞের কার্যকলাপ বর্ণনা করছেন। আদি মনু তাঁর পত্নী শতরূপা সহ সুন্দা নদীর তীরে এক বনে তপস্যা করতে গিয়েছিলেন। তাঁরা বহু শত বৎসর তপস্যা করেছিলেন এবং তারপর মনু সমাধি যোগে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। তখন রাক্ষস এবং অসুরেরা তাঁকে গ্রাস করার চেষ্টা করে, কিন্তু যজ্ঞ তাঁর যাম নামক পুত্রগণ এবং দেবতাগণ সহ তাদের সংহার করেছিলেন। তারপর যজ্ঞ দেবরাজ ইন্দ্রের পদ গ্রহণ করেন।

স্বারোচিষ নামক দ্বিতীয় মনু ছিলেন অগ্নির পুত্র, এবং তাঁর পুত্রদের মধ্যে দ্যুমৎ, সুষেণ এবং রোচিষ ছিলেন মুখ্য। এই মনুর রাজত্বকালে রোচন স্বর্গলোকের রাজা ইন্দ্রের পদ প্রাপ্ত হন, এবং সেখানে তুষিত আদি বহু দেবতারাও ছিলেন, এবং তাছাড়া উর্জ, স্তম্ভ আদি বহু মহর্ষিও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বেদশিরার পত্নী তুষিতার গর্ভে বিভুর জন্ম হয়। বিভু অষ্টাশি হাজার দৃঢ়ব্রত মহর্ষিদের আত্ম-সংযম এবং তপস্যার উপদেশ দিয়েছিলেন।

প্রিয়ব্রতের পুত্র উত্তম ছিলেন তৃতীয় মনু। তাঁর পুত্রদের মধ্যে পবন, সৃঞ্জয় এবং যজ্ঞহোত্র মুখ্য। এই মনুর রাজত্বকালে প্রমদ আদি বশিষ্ঠের পুত্রগণ সপ্তঋষি হয়েছিলেন। সত্য, দেবশ্রুত এবং ভদ্র আদি দেবতা হয়েছিলেন এবং সত্যজিৎ হয়েছিলেন ইন্দ্র। ধর্মের পত্নী সুনৃতার গর্ভ থেকে সত্যসেন রূপে ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং তিনি সত্যজিতের সঙ্গে সংগ্রামকারী সমস্ত যক্ষ ও রাক্ষসদের সংহার করেছিলেন।

তৃতীয় মনুর ভ্রাতা তামস চতুর্থ মনু হয়েছিলেন এবং পৃথু, খ্যাতি, নর, কেতু

আদি তাঁর দশ পুত্র ছিল। তাঁর রাজত্বকালে সত্যক, হরি, বীর প্রভৃতি দেবতা হয়েছিলেন, জ্যোতির্ধাম আদি সপ্তর্ষি হয়েছিলেন এবং ত্রিশিখা ইন্দ্র হয়েছিলেন। হরিমেধার পত্নী হরিণীর গর্ভে হরি নামক একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই হরি ভগবানের এক অবতার, তিনি ভক্ত গজেন্দ্রকে রক্ষা করেন। এই ঘটনা গজেন্দ্র-মোক্ষণ রূপে বর্ণিত হয়েছে। এই অধ্যায়ের শেষে পরীক্ষিৎ মহারাজ বিশেষভাবে এই ঘটনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

স্বায়ত্ত্ববস্যেহ গুরো বংশোহয়ং বিস্তরাচ্ছতঃ ।

যত্র বিশ্বসৃজাং সর্গো মনুনন্যান্ বদস্ব নঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—রাজা (মহারাজ পরীক্ষিৎ) বললেন; স্বায়ত্ত্ববস্য—মহাত্মা স্বায়ত্ত্বব মনুর; ইহ—এই সম্পর্কে; গুরো—হে গুরুদেব; বংশঃ—বংশ; অয়ম্—এই; বিস্তরাৎ—বিস্তারিতভাবে; শ্রুতঃ—আমি শুনেছি (আপনার কাছ থেকে); যত্র—যেখানে; বিশ্ব-সৃজাম্—মরীচি আদি প্রজাপতি নামক মহাপুরুষদের; স্বর্গঃ—সৃষ্টি, মনুর কন্যা থেকে বহু পুত্র এবং পৌত্রের জন্ম প্রসঙ্গে; মনুন্—মনুগণ; অন্যান্—অন্যদের; বদস্ব—দয়া করে বর্ণনা করুন; নঃ—আমাদের।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে গুরুদেব, আপনার কৃপায় আমি স্বায়ত্ত্বব মনুর বংশ-বৃত্তান্ত পূর্ণরূপে শ্রবণ করলাম। কিন্তু অন্য মনুদের সম্বন্ধেও আমি শ্রবণ করতে ইচ্ছুক। দয়া করে আপনি তাঁদের কথা বর্ণনা করুন।

শ্লোক ২

মন্বন্তরে হরের্জন্ম কৰ্ম্মাণি চ মহীয়সঃ ।

গুণন্তি কবয়ো ব্রহ্মংস্তানি নো বদ শৃণ্বতাম্ ॥ ২ ॥

মন্বন্তরে—মন্বন্তরের পরিবর্তনের সময় (এক মনু থেকে অন্য মনুর অন্তর); হরেঃ—ভগবান শ্রীহরির; জন্ম—আবির্ভাব; কৰ্ম্মাণি—এবং কার্যকলাপ; চ—ও; মহীয়সঃ—পরম যশস্বীর; গুণন্তি—বর্ণনা করেন; কবয়ঃ—পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন

মহাজ্ঞানী ব্যক্তিগণ; ব্রহ্মন্—হে বিদ্বান ব্রাহ্মণ (শুকদেব গোস্বামী); তানি—
তঁারা সকলে; নঃ—আমাদের; বদ—দয়া করে বর্ণনা করুন; শৃণ্বতাম্—শ্রবণে
অত্যন্ত আগ্রহী।

অনুবাদ

হে ব্রহ্মজ্ঞানী শুকদেব গোস্বামী, পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন মহাজ্ঞানী ব্যক্তির বিভিন্ন
মহন্তরে ভগবানের কার্যকলাপ এবং আবির্ভাবের বর্ণনা করেন। সেই সমস্ত বর্ণনা
শ্রবণ করতে আমরা অত্যন্ত আগ্রহী। দয়া করে তা বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

ভগবানের গুণাবতার, মন্বন্তর অবতার, লীলাবতার, যুগাবতার আদি বিবিধ অবতার
রয়েছে, এবং শাস্ত্রে তাঁদের পূর্ণ বর্ণনা আছে। শাস্ত্র-প্রমাণ ব্যতীত কাউকে ভগবানের
অবতার বলে স্বীকার করার কোন প্রশ্নই হতে পারে না। তাই, এখানে বিশেষভাবে
উল্লেখ করা হয়েছে, গুণন্তি কবয়ঃ—পূর্ণজ্ঞান সমন্বিত মহান পণ্ডিতগণ ভগবানের
বিভিন্ন অবতারের বর্ণনা স্বীকার করেন। বর্তমান সময়ে, বিশেষ করে ভারতবর্ষে,
বহু ভণ্ড নিজেদের অবতার বলে প্রচার করছে এবং সাধারণ মানুষেরা তাদের
দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে। তাই, শাস্ত্রের বর্ণনার দ্বারা এবং অদ্ভুত কার্যকলাপের
দ্বারা ভগবানের অবতার নির্ধারণ করতে হয়। এই শ্লোকে মহীয়সঃ শব্দটির দ্বারা
ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ভগবানের অবতারের কার্যকলাপ কোন সাধারণ যাদু বা
ভেলকিবাজি নয়, সেই সমস্ত কার্যকলাপ সত্যিই আশ্চর্যজনক। এইভাবে ভগবানের
যে কোন অবতারকে চিনতে হয় শাস্ত্র প্রমাণের ভিত্তিতে এবং তাঁর অদ্ভুত
কার্যকলাপের মাধ্যমে। পরীক্ষিৎ মহারাজ বিভিন্ন যুগের মনুদের কথা শুনতে
চেয়েছিলেন। ব্রহ্মার একদিনে চতুর্দশ মনুর আবির্ভাব হয়, এবং প্রত্যেক মনুর
আয়ুষ্কাল একান্তর যুগ। এইভাবে ব্রহ্মার এক জীবনে হাজার হাজার মনু রয়েছেন।

শ্লোক ৩

যদ্যস্মিন্নন্তরে ব্রহ্মন্ ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ ।

কৃতবান্ কুরুতে কৰ্তা হ্যতীতেহনাগতেহদ্য বা ॥ ৩ ॥

যৎ—যে কোন কার্যকলাপ; যস্মিন্—কোন বিশেষ যুগে; অন্তরে—মন্বন্তরে;
ব্রহ্মন্—হে মহান ব্রাহ্মণ; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; বিশ্ব-ভাবনঃ—যিনি এই

জগৎ সৃষ্টি করেছেন; কৃতবান্—করেছেন; কুরুতে—করছেন; কৰ্তা—এবং করবেন; হি—বস্তুতপক্ষে; অতীতে—অতীতে; অনাগতে—ভবিষ্যতে; অদ্য—বর্তমানে; বা—অথবা।

অনুবাদ

হে মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণ, এই জগতের সৃষ্টিকৰ্তা ভগবান অতীত মন্বন্তরে যে সমস্ত কার্য করেছেন, বর্তমানে যা করছেন এবং আগামী মন্বন্তরে যা করবেন, তা দয়া করে আমাদের কাছে বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন যে, তিনি এবং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত অন্য সমস্ত জীবগণ সকলেই অতীতে ছিলেন, বর্তমানে রয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভগবান এবং জীব উভয়েরই জন্য বর্তমান। নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্। ভগবান এবং জীব উভয়েই নিত্য এবং চেতন, কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্য কেবল এই যে, ভগবান হচ্ছেন অসীম কিন্তু জীব সসীম। ভগবান সব কিছুর স্রষ্টা, এবং জীবসমূহ যদিও সৃষ্ট নয়, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে তাদের অস্তিত্ব নিত্য, তবুও তাদের শরীর সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে ভগবানের শরীর কখনও সৃষ্টি করা হয়নি। ভগবান এবং তাঁর শরীরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু জীবাত্মা নিত্য হলেও সে তাঁর শরীর থেকে ভিন্ন।

শ্লোক ৪

শ্রীঋষিরুবাচ

মনবোহস্মিন্ ব্যতীতাঃ ষট্ কল্পে স্বায়ত্ত্ববাদয়ঃ ।

আদ্যন্তে কথিতো যত্র দেবাদীনাং চ সম্ভবঃ ॥ ৪ ॥

শ্রী-ঋষিঃ উবাচ—মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী বললেন; মনবঃ—মনুগণ; অস্মিন্—এই কল্পে (ব্রহ্মার একদিনে); ব্যতীতাঃ—অতীত হয়েছে; ষট্—ছয়; কল্পে—ব্রহ্মার একদিনে; স্বায়ত্ত্বব—স্বায়ত্ত্বব মনু; আদয়ঃ—অন্যেরা; আদ্যঃ—প্রথম (স্বায়ত্ত্বব); তে—আপনাকে; কথিতঃ—আমি ইতিপূর্বেই বর্ণনা করেছি; যত্র—যেখানে; দেব-আদীনাম্—সমস্ত দেবতাদের; চ—ও; সম্ভবঃ—উৎপত্তি।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এই কল্পে ছয়জন মনু ইতিমধ্যেই অতীত হয়েছেন। আমি আপনার কাছে স্বায়ত্ত্ব মনু এবং দেবতাদের উৎপত্তির কথা বর্ণনা করেছি। ব্রহ্মার এই কল্পে স্বায়ত্ত্বই প্রথম মনু।

শ্লোক ৫

আকৃত্যাং দেবহৃত্যাং চ দুহিত্রোস্তস্য বৈ মনোঃ ।
ধর্মজ্ঞানোপদেশার্থং ভগবান্ পুত্রতাং গতঃ ॥ ৫ ॥

আকৃত্যাম্—আকৃতির গর্ভ থেকে; দেবহৃত্যাম্ চ—এবং দেবহুতির গর্ভ থেকে; দুহিত্রোঃ—দুই কন্যার; তস্য—তার; বৈ—বস্তুতপক্ষে; মনোঃ—স্বায়ত্ত্ব মনুর; ধর্ম—ধর্ম; জ্ঞান—জ্ঞান; উপদেশ-অর্থম্—উপদেশ দেওয়ার জন্য; ভগবান্—ভগবান; পুত্রতাম্—আকৃতি এবং দেবহুতির পুত্রত্ব; গতঃ—গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

স্বায়ত্ত্ব মনুর দুই কন্যা আকৃতি এবং দেবহুতির গর্ভে ভগবান যথাক্রমে যজ্ঞমূর্তি এবং কপিল নামে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরা ধর্ম এবং জ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

দেবহুতির পুত্রের নাম কপিল এবং আকৃতির পুত্রের নাম যজ্ঞমূর্তি। তাঁরা উভয়েই ধর্ম এবং দার্শনিক জ্ঞানের শিক্ষা দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৬

কৃতং পুরা ভগবতঃ কপিলস্যানুবর্ণিতম্ ।
আখ্যাস্যে ভগবান্ যজ্ঞো যচ্চকার কুরুদ্বহ ॥ ৬ ॥

কৃতম্—ইতিমধ্যেই করা হয়েছে; পুরা—পূর্বে; ভগবতঃ—ভগবানের; কপিলস্য—দেবহুতি পুত্র কপিলের; অনুবর্ণিতম্—পূর্ণরূপে বর্ণনা করা হয়েছে; আখ্যাস্যে—আমি এখন বর্ণনা করব; ভগবান্—ভগবান; যজ্ঞঃ—যজ্ঞপতি বা যজ্ঞমূর্তি নামক; যৎ—যা কিছু; চকার—অনুষ্ঠান করেছিলেন; কুরুদ্বহ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, আমি পূর্বেই (তৃতীয় স্কন্ধে) দেবহুতি-পুত্র কপিলের কার্যকলাপ বর্ণনা করেছি। এখন আমি আপনার কাছে আকৃতির পুত্র যজ্ঞপতির কার্যকলাপ বর্ণনা করব।

শ্লোক ৭

বিরক্তঃ কামভোগেষু শতরূপাপতিঃ প্রভুঃ ।

বিসৃজ্য রাজ্যং তপসে সভার্যো বনমাবিশৎ ॥ ৭ ॥

বিরক্তঃ—অনাসক্ত; কাম-ভোগেষু—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে (গৃহস্থ-জীবনে); শতরূপা-পতিঃ—শতরূপার পতি স্বায়ত্ত্ব মনু; প্রভুঃ—যিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বের প্রভু বা রাজা; বিসৃজ্য—সর্বতোভাবে ত্যাগ করে; রাজ্যম্—তঁার রাজ্য; তপসে—তপস্যা করার জন্য; স-ভার্যঃ—তঁার পত্নী সহ; বনম্—বনে; আবিশৎ—প্রবেশ করেছিলেন।

অনুবাদ

শতরূপার পতি স্বায়ত্ত্ব মনু স্বভাবতই ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি অনাসক্ত ছিলেন। তাই তিনি রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করে, তপস্যা করার জন্য তঁার পত্নী সহ বনে প্রবেশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৪/২) উল্লেখ করা হয়েছে, এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ—“এই পরম বিজ্ঞান পরম্পরা সূত্রে রাজর্ষিগণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।” সমস্ত মনুরা ছিলেন আদর্শ রাজা। তঁারা ছিলেন রাজর্ষি। অর্থাৎ, তঁারা এই পৃথিবীর রাজা হলেও তঁারা ছিলেন ঋষিতুল্য। যেমন, স্বায়ত্ত্ব মনু পৃথিবীর সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও তঁার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের কোন বাসনা ছিল না। এটিই রাজতন্ত্রের অর্থ। রাজা বা সম্রাট এমনভাবে শিক্ষা লাভ করেন যে, স্বভাবতই তিনি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের প্রতি অনাসক্ত হন। এমন নয় যে রাজা হওয়ার ফলে তিনি অনর্থক ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য অর্থ ব্যয় করবেন। রাজারা যখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য অর্থ ব্যয় করে অধঃপতিত হন, তখন তঁাদের সর্বনাশ হয়। তেমনই, বর্তমান সময়ে, রাজতন্ত্র লুপ্ত হয়ে গেছে এবং মানুষ প্রজাতন্ত্র সৃষ্টি করেছে, কিন্তু তাও ব্যর্থ হয়েছে। এখন, প্রকৃতির নিয়মে এমন একটি সময় আসছে, যখন নাগরিকেরা একনায়কত্বের

ফলে অধিক থেকে অধিকতর দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করবে। যদি রাজা বা সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক এককভাবে, অথবা প্রজাতান্ত্রিক সরকারের সদস্যেরা যৌথভাবে মনুসংহিতার আইন অনুসারে রাজ্য পালন করতে না পারে, তা হলে সেই সরকার অবশ্যই স্থায়ী হবে না।

শ্লোক ৮

সুনন্দায়াং বর্ষশতং পদৈকেন ভুবং স্পৃশন্ ।

তপ্যমানস্তপো ঘোরমিদমব্রাহ ভারত ॥ ৮ ॥

সুনন্দায়াম্—সুনন্দা নদীর তীরে; বর্ষশতম্—একশ বছর; পদ-একেন—এক পায়ে; ভুবম্—ভূমি; স্পৃশন্—স্পর্শ করে; তপ্যমানঃ—তপস্যা করেছিলেন; তপঃ—তপস্যা; ঘোরম্—অত্যন্ত কঠোর; ইদম্—নিম্নবর্ণিত; অব্রাহ—এবং বলেছিলেন; ভারত—হে ভারত-কুলশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

হে ভারত, স্বায়ত্ত্বব মনু তাঁর পত্নী সহ বনে গমন করে সুনন্দা নদীর তীরে এক পায়ে ভূমি স্পর্শ করে একশ বছর ঘোর তপস্যা করেছিলেন। তপস্যা করার সময় তিনি এই কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, অব্রাহ শব্দটির অর্থ হচ্ছে তিনি জপ করেছিলেন অথবা মনে মনে বলেছিলেন, এমন নয় যে তিনি কাউকে বক্তৃতা দিয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৯

শ্রীমনুরূবাচ

যেন চেতয়তে বিশ্বং বিশ্বং চেতয়তে ন যম্ ।

যো জাগর্তি শয়ানেহস্মিন্ নাযং তং বেদ বেদ সঃ ॥ ৯ ॥

শ্রী-মনুঃ উবাচ—স্বায়ত্ত্বব মনু বলেছিলেন; যেন—যাঁর দ্বারা (ভগবান); চেতয়তে—চেতন হয়েছে; বিশ্বম্—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড; বিশ্বম্—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড (জড় জগৎ);

চেতয়তে—চেতন হয়; ন—না; যম্—যাঁকে; যঃ—যিনি; জাগর্তি—সর্বদা জাগ্রত (সমস্ত কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করছেন); শয়ানে—শয়ন করার সময়; অশ্মিন্—এই শরীরে; ন—না; অয়ম্—এই জীব; তম্—তাকে; বেদ—জানেন; বেদ—জানেন; সঃ—তিনি।

অনুবাদ

মনু বললেন—পরমেশ্বর ভগবান চৈতন্যযুক্ত এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন; এমন নয় যে তিনি এই জড় জগতের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছেন। সব কিছু নিদ্রিত হলেও ভগবান সাক্ষীরূপে জাগ্রত থাকেন। জীব তাঁকে জানে না, কিন্তু তিনি সব কিছু জানেন।

তাৎপর্য

এখানে ভগবান এবং জীবের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্। বেদের বর্ণনা অনুসারে ভগবান হচ্ছেন পরম নিত্য, পরম চেতন। ভগবান এবং সাধারণ জীবের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, যখন জড় জগতের প্রলয় হয়, তখন সমস্ত জীবেরা বিস্মৃতি, স্বপ্ন অথবা অচেতন অবস্থায় মৌন থাকে, কিন্তু ভগবান সব কিছুর সাক্ষীরূপে জাগ্রত থাকেন। এই জড় জগতের সৃষ্টি হয়েছে, কিছুকালের জন্য তার অস্তিত্ব থাকে এবং তারপর তার লয় হয়। এই সমস্ত পরিবর্তনেও কিন্তু ভগবান জাগ্রত থাকেন। জড়-জাগতিক বদ্ধ অবস্থায় জীবের তিনটি স্বপ্নের অবস্থা রয়েছে। জড় জগৎ যখন জাগ্রত এবং সক্রিয় থাকে, তখন সেটি এক প্রকার স্বপ্ন—জাগ্রত স্বপ্ন। নিদ্রিত অবস্থায় জীব আর এক প্রকার স্বপ্ন দেখে, এবং প্রলয়ের সময় যখন সে অচেতন হয়ে যায়, তখন সে আর এক প্রকার স্বপ্নে প্রবেশ করে। তাই এই জড় জগতের যে কোন অবস্থাতেই তারা সকলে স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু চিৎ-জগতে সব কিছুই জাগ্রত।

শ্লোক ১০

আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥ ১০ ॥

আত্ম—পরমাত্মা; আবাস্যম্—সর্বত্র বাস করেন; ইদম্—এই; বিশ্বম্—সমগ্র জগৎ, সমস্ত স্থান; যৎ—যা কিছু; কিঞ্চিৎ—যা কিছুই অস্তিত্ব রয়েছে; জগত্যাং—এই

জগতে, সর্বত্র; জগৎ—সব কিছু, স্থাবর এবং জঙ্গম; তেন—তঁার দ্বারা; ত্যক্তেন—নির্ধারিত; ভুক্তীথাঃ—ভোগ করতে পার; মা—করো না; গৃধঃ—গ্রহণ; কস্যস্বিৎ—অন্য কারও; ধনম্—ধন।

অনুবাদ

এই জগতে যেখানে স্থাবর এবং জঙ্গম প্রাণী রয়েছে, সেখানেই ভগবান পরমাত্মারূপে বিরাজমান। তাই তিনি যেটুকু বরাদ্দ নির্ধারণ করেছেন, কেবল সেটুকুই গ্রহণ করা উচিত; কখনও অন্যের ধন আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়।

তাৎপর্য

স্বায়ম্ভুব মনু ভগবানের চিন্ময় স্থিতি বর্ণনা করার পর, তাঁর পুত্র এবং পৌত্রদের উপদেশ দিয়ে বলেছেন যে, এই জগতের সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের। মনুর এই উপদেশ কেবল তাঁর পুত্র এবং পৌত্রদের জন্যই নয়, সমগ্র মানব-সমাজের জন্য। মানুষ বা সংস্কৃতে মনুষ্য শব্দটি আসছে মনু থেকে, কারণ সমস্ত মানুষ আদি মনুর বংশধর। ভগবদ্গীতাতেও (৪/১) মনুর উল্লেখ করে ভগবান বলেছেন—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।

বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেহব্রবীৎ ॥

“পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আমি পূর্বে সূর্যদেব বিবস্বানকে এই অব্যয় নিষ্কাম কর্মসাধ্য জ্ঞানযোগ বলেছিলাম। সূর্য তা মানবজাতির জনক মনুকে বলেন এবং মনু তা ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন।” স্বায়ম্ভুব মনু এবং বৈবস্বত মনু উভয়েরই দায়িত্ব একই। বৈবস্বত মনু হচ্ছেন সূর্যদেব বিবস্বানের পুত্র এবং তাঁর পুত্র ইক্ষ্বাকু, যিনি ছিলেন সারা পৃথিবীর রাজা। যেহেতু মনু মানব-সমাজের আদি পিতা, তাই মানব-সমাজের কর্তব্য তাঁর উপদেশ পালন করা।

স্বায়ম্ভুব মনু নির্দেশ দিয়েছেন যে, কেবল চিৎ-জগতেই নয়, এই জড় জগতেও যা কিছু রয়েছে তা সবই ভগবানের সম্পত্তি, এবং ভগবান পরম চেতনারূপে সর্বত্র বিরাজমান। ভগবদ্গীতায় (১৩/৩) প্রতিপন্ন হয়েছে, ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত—প্রত্যেক ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রতিটি শরীরে, ভগবান পরমাত্মারূপে বিরাজমান। জীবাত্মা ভগবানের উপদেশ অনুসারে বাস ও কর্ম করার জন্য একটি শরীর প্রাপ্ত হয়, এবং তাই ভগবানও সেই শরীরে তার সঙ্গে থাকেন। আমাদের মনে করা উচিত নয় যে, আমরা স্বাধীন; পক্ষান্তরে, আমাদের বোঝা উচিত যে,

ভগবানের সম্পত্তির একটি অংশ আমাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

এই উপলব্ধি আমাদের আদর্শ সাম্যবাদের পথে পরিচালিত করবে। সাম্যবাদীরা কেবল তাদের নিজেদের রাষ্ট্রের পরিপ্রেক্ষিতে সাম্যবাদের কথা চিন্তা করে, কিন্তু এখানে যে আধ্যাত্মিক সাম্যবাদের উল্লেখ করা হয়েছে, তা কেবল রাষ্ট্রকেন্দ্রিক নয়, তা বিশ্বজনীন। কোন কিছুই কোন রাষ্ট্রের বা ব্যক্তির সম্পত্তি নয়; সব কিছুই ভগবানের অধিকারভুক্ত। সেটিই এই শ্লোকের তাৎপর্য। *আত্মবাস্যমিদং বিশ্বম্—* এই ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছুর অস্তিত্ব রয়েছে, তা সবই ভগবানের সম্পদ। সব কিছুই ভগবানের, এই উপলব্ধির দ্বারা আধুনিক সাম্যবাদের সিদ্ধান্ত এবং রাষ্ট্রসংঘের ধারণার সংশোধন করা সম্ভব। ভগবান আমাদের কল্লনার সৃষ্টি নয়, পক্ষান্তরে তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। *আত্মবাস্যমিদং বিশ্বম্। ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্।* এই বিশ্বজনীন সাম্যবাদ পৃথিবীর সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে।

বৈদিক শাস্ত্র থেকে মানুষের জানা উচিত যে, জীবের দেহটিও তার সম্পত্তি নয়, কিন্তু তার কর্ম অনুসারে তাকে সেটি দেওয়া হয়েছে। কর্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দেহোপপত্তয়ে। চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনি যন্ত্রস্বরূপ জীবকে দান করা হয়েছে। সেই কথা ভগবদ্গীতায় (১৮/৬১) প্রতিপন্ন হয়েছে—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।

ব্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রাকৃঢ়ানি মায়য়া ॥

“হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।” পরমাত্মারূপে ভগবান সকলের হৃদয়ে বিরাজ করে জীবের বিভিন্ন বাসনা অবলোকন করছেন। ভগবান এতই কৃপাময় যে, তিনি জীবকে উপযুক্ত শরীরে তার বিচিত্র বাসনা উপভোগ করার সুযোগ দিচ্ছেন। আর সেই শরীরগুলি যন্ত্রের মতো (*যন্ত্রাকৃঢ়ানি মায়য়া*)। এই যন্ত্রগুলি ভগবানের বহিরঙ্গ প্রকৃতির জড় উপাদানের দ্বারা রচিত, এবং এইভাবে জীব তার বাসনা অনুসারে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ করে। জীবকে এই সুযোগটি দেন পরমাত্মা।

সব কিছুই ভগবানের এবং তাই অন্যের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে অধিকার করা উচিত নয়। আমাদের অনেক কিছু তৈরি করার প্রবণতা রয়েছে। বিশেষ করে আধুনিক যুগে আমরা গগনচুম্বী প্রাসাদ তৈরি করছি এবং নানা রকম সুযোগ-সুবিধার উদ্ভাবন করছি। কিন্তু আমাদের জানা উচিত যে, এই সমস্ত গগনচুম্বী প্রাসাদ এবং বিভিন্ন রকম যন্ত্রের উপাদানগুলি ভগবানের, সেগুলি ভগবান ছাড়া অন্য কেউ তৈরি করতে পারে না। সমগ্র জগৎ পাঁচটি জড় উপাদানের (*তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ*) সমন্বয় মাত্র। গগনচুম্বী প্রাসাদগুলি মাটি, জল এবং আগুনের বিকার

মাত্র। মাটি এবং জলের মিশ্রণকে যখন আগুনে পোড়ানো হয়, তখন ইঁট তৈরি হয় এবং গগনচুম্বী প্রাসাদগুলি মূলত ইঁট দিয়ে তৈরি। মানুষ যদিও ইঁট তৈরি করতে পারে, কিন্তু ইঁটের উপাদানগুলি সে তৈরি করতে পারে না। মানুষ অবশ্য নির্মাতারূপে ভগবানের কাছ থেকে বেতন প্রাপ্ত হতে পারে। এখানে সেই সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে—*তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ*। কেউ একটি বিশাল গগনচুম্বী প্রাসাদ করতে পারে, কিন্তু তার নির্মাতা, ব্যবসায়ী, মজুর, কেউই তার মালিকানা দাবি করতে পারে না। মালিকানা কেবল তিনিই দাবি করতে পারেন, যিনি সেই প্রাসাদটির জন্য ব্যয় করেছেন। ভগবান মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ সৃষ্টি করেছেন, এবং সেগুলি ব্যবহার করে কেউ বেতন নিতে পারে (*তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ*)। কিন্তু, কেউ তার মালিকানা দাবি করতে পারে না। এটিই হচ্ছে আদর্শ সাম্যবাদ। আমাদের বড় বড় প্রাসাদ তৈরি করার প্রবণতা বিশাল এবং ঐশ্বর্য সমন্বিত মন্দির নির্মাণ করার জন্য ব্যবহার করা উচিত, যাতে ভগবানের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা যায়। তা হলে আমাদের নির্মাণ করার বাসনা সার্থক হবে।

যেহেতু সব কিছুই ভগবানের সম্পত্তি, তাই সব কিছুই ভগবানকে নিবেদন করা উচিত, এবং আমাদের কেবল প্রসাদ গ্রহণ করা উচিত (*তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ*)। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু আত্মসাৎ করার জন্য আমাদের নিজেদের মধ্যে মারামারি করা উচিত নয়। সেই সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির মহারাজকে নারদ মুনি বলেছেন—

যাবদ্ ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্ ।

অধিকং যোহভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমহতি ॥

“প্রাণ ধারণের জন্য যতখানি অর্থের প্রয়োজন ততটুকুই কেবল অধিকার করা উচিত, তার অধিক অধিকার করা হলে চুরি করা হয় এবং সে তখন প্রকৃতির নিয়মে দণ্ডনীয় হয়।” (শ্রীমদ্ভাগবত ৭/১৪/৮) নিঃসন্দেহে আমাদের আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুনের আবশ্যিকতা রয়েছে, কিন্তু ভগবান যেহেতু পশু-পক্ষীদের জন্য সেই চাহিদাগুলি মেটাবার ব্যবস্থা করেছেন, মানুষদের জন্য কেন তিনি করবেন না? অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের কোন প্রয়োজন নেই; সব কিছুই ব্যবস্থা ভগবান করে রেখেছেন। তাই মানুষের বোঝা উচিত যে, সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের এবং সেই উপলব্ধির ভিত্তিতে ভগবানের প্রসাদরূপে সব কিছু গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু কেউ যদি অন্যের বরাদ্দতে হস্তক্ষেপ করে, তা হলে সে একটি চোর। আমাদের প্রকৃতিই যতটুকু প্রয়োজন, তার অধিক গ্রহণ করা উচিত নয়। তাই, দৈবক্রমে আমরা যদি অনেক ধন প্রাপ্ত হই, তা হলে সব সময় মনে রাখা উচিত যে, তা ভগবানের

সম্পত্তি। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আমরা যথেষ্ট ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হচ্ছি, কিন্তু আমাদের কখনই মনে করা উচিত নয় যে, সেই ধন আমাদের; তা ভগবানের এবং তা শ্রমিক বা ভক্তদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করা উচিত। কোন ভক্তের দাবি করা উচিত নয় যে, কোন ধন অথবা সম্পত্তি তাঁর। কেউ যদি মনে করে যে, এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কোন অংশ তার সম্পত্তি, তা হলে সে একটি চোর এবং প্রকৃতির নিয়মে তাকে দণ্ডভোগ করতে হবে। দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যা—কেউই প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করতে পারে না অথবা প্রকৃতির কাছে তার অভিসন্ধি লুকাতে পারে না। মানব-সমাজ যদি অন্যায়ভাবে, ব্যক্তিগতভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডকে মানুষের সম্পত্তি বলে দাবি করে, তা হলে সমগ্র মানব-সমাজ একটি চোরের সমাজরূপে অভিশপ্ত হবে এবং প্রকৃতির নিয়মে তাকে দণ্ডভোগ করতে হবে।

শ্লোক ১১

যং পশ্যতি ন পশ্যন্তং চক্ষুর্যস্য ন রিম্যতি ।

তং ভূতনিলয়ং দেবং সুপর্ণমুপধাবত ॥ ১১ ॥

যম্—যাঁকে; পশ্যতি—জীব দর্শন করে; ন—না; পশ্যন্তম্—সর্বদা দর্শন করা সত্ত্বেও; চক্ষুঃ—চক্ষু; যস্য—যার; ন—কখনই না; রিম্যতি—হাস হয়; তম্—তাঁকে; ভূত-নিলয়ম্—সমস্ত জীবের আদি উৎস; দেবম্—পরমেশ্বর ভগবান; সুপর্ণম্—যিনি সখারূপে জীবের সঙ্গে থাকেন; উপধাবত—সকলের পূজা করা উচিত।

অনুবাদ

ভগবান যদিও নিরন্তর সমগ্র বিশ্বের কার্যকলাপ দর্শন করেন, তবুও তাঁকে কেউ দর্শন করতে পারে না। কিন্তু, তা বলে এই মনে করা উচিত নয় যে, যেহেতু কেউই তাঁকে দেখতে পায় না, তাই তিনিও কিছুই দেখছেন না, কারণ তাঁর দর্শন শক্তি কখনও বিনষ্ট হয় না। তাই সকলেরই কর্তব্য জীবাত্মার সঙ্গে সখারূপে যিনি নিরন্তর বিরাজ করেন, সেই পরমাত্মার আরাধনা করা।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করে পাণ্ডবদের মাতা শ্রীমতী কুন্তীদেবী বলেছিলেন, অলক্ষ্যং সর্বভূতানামন্তরীকৃতম্—“হে কৃষ্ণ, তুমি সকলের অন্তরে এবং বাইরে বিরাজ কর, তবুও নির্বোধ বদ্ধ জীব তোমাকে দেখতে পায় না।” ভগবদ্গীতায় বলা

হয়েছে যে, জ্ঞানচক্ষুঃ অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা ভগবানকে দর্শন করা যায়। যিনি সেই জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করেন তিনি হচ্ছেন শ্রীগুরুদেব। তাই আমরা শ্রীগুরুদেবের বন্দনা করে বলি—

ওঁ অজ্ঞানতিমিরাক্ষস্য জ্ঞানাজ্ঞনশলাকয়া ।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

“আমি শ্রীগুরুদেবকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি জ্ঞানের প্রদীপের দ্বারা অজ্ঞানের প্রভাবে অন্ধ আমার চক্ষু উন্মীলিত করেছেন।” (গৌতমীয় তন্ত্র) শ্রীগুরুদেবের কর্তব্য হচ্ছে শিষ্যের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করা। শিষ্য যখন অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে জেগে ওঠে, তখন সে সর্বত্র ভগবানকে দর্শন করতে পারে, কারণ ভগবান সর্বত্রই বিরাজমান। অণুত্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থম্। ভগবান ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে রয়েছেন, তিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজ করছেন, এবং তিনি প্রতিটি পরমাণুর ভিতরেও রয়েছেন। আমাদের প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে আমরা ভগবানকে দর্শন করতে পারি না, কিন্তু একটু বিচার করলে সর্বত্র ভগবানকে দর্শন করা সম্ভব হয়। সেই জন্য শিক্ষার প্রয়োজন হয়। একটু বিচার করলে সব চাইতে অধঃপতিত ব্যক্তিও ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করতে পারে। আমরা যদি বিচার করি এই বিশাল সমুদ্র কার সম্পত্তি, এই বিশাল ভূখণ্ড কার সম্পত্তি, আকাশের অস্তিত্ব রয়েছে কিভাবে, নভোমণ্ডলে অনন্ত কোটি গ্রহ-নক্ষত্র কিভাবে বিরাজ করছে, কে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন এবং এটি কার সম্পত্তি, তা হলে আমরা নিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, সব কিছুরই একজন মালিক রয়েছেন। আমরা যখন ব্যক্তিগতভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে পরিবার বা রাষ্ট্ররূপে কোন ভূখণ্ডের উপর মালিকানা দাবি করি, তখন আমাদের বিবেচনা করে দেখা উচিত সেই মালিকানা আমরা কিভাবে প্রাপ্ত হয়েছি। আমাদের জন্মের পূর্বে, সেই ভূখণ্ডে আসার পূর্বে, সেই ভূখণ্ডটি ছিল। তা হলে আমরা মালিক হলাম কি করে? সেই বিচার-বিবেচনা আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে যে, সব কিছুরই একজন পরম মালিক বা পরম ঈশ্বর রয়েছেন—তিনি হচ্ছেন ভগবান।

ভগবান সর্বদাই জাগ্রত। বদ্ধ অবস্থায় আমরা ভুলে যাই কারণ আমাদের দেহের পরিবর্তন হয়, কিন্তু ভগবানের শরীরের যেহেতু পরিবর্তন হয় না, তাই তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত কথা মনে রাখতে পারেন। ভগবদ্গীতায় (৪/১) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্—“এই ভগবৎ-তত্ত্ববিজ্ঞান ভগবদ্গীতা আমি অন্ততপক্ষে চার কোটি বছর আগে সূর্যদেবকে বলেছিলাম।” অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি কিভাবে এতকাল পূর্বের ঘটনা

মনে রেখেছেন, তখন অর্জুনকে ভগবান বলেছিলেন যে, অর্জুনও সেই সময় উপস্থিত ছিলেন, কারণ শ্রীকৃষ্ণের সখা হওয়ার ফলে শ্রীকৃষ্ণ যেখানে যান অর্জুনও সেখানে যান, কিন্তু অর্জুন অত্যন্ত ক্ষুদ্র অণুসদৃশ জীবাত্মা হওয়ার ফলে ভুলে যান, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সব কিছু স্মরণ রাখেন। তাই বলা হয় যে, ভগবানের সতর্ক পর্যবেক্ষণের কখনও হ্রাস হয় না। সেই কথা ভগবদ্গীতাতেও (১৫/১৫) প্রতিপন্ন হয়েছে, সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানম্ অপোহনং চ—পরমাত্মারূপে ভগবান সর্বদা সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান এবং তাঁর থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে। সেই কথা এই শ্লোকেও সুপর্ণম্ অর্থাৎ ‘সখা’ শব্দটির দ্বারা সূচিত হয়েছে। শ্বেতাস্বতর উপনিষদে (৪/৬) তাই বলা হয়েছে, দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে—দুটি পাখি একটি গাছে বন্ধুর মতো বসে রয়েছে। তাদের একটি সেই গাছের ফল খাচ্ছে এবং অন্য পাখিটি কেবল তাকে দেখছে। দর্শনকারী পাখিটি সর্বদাই ফল সেবনকারী পাখিটির সখারূপে তাকে তার ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করার স্মৃতি দিচ্ছে। এইভাবে যদি আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ভগবানের কথা বিচার করি, তা হলে আমরা তাঁকে দর্শন করতে পারি অথবা সর্বত্র তাঁর উপস্থিতি অন্তত অনুভব করতে পারি।

চক্ষুর্যস্য ন রিষ্যতি পদটির অর্থ হচ্ছে যে, যদিও আমরা তাঁকে দেখতে পাই না, তার অর্থ এই নয় যে তিনি আমাদের দেখতে পান না। এমন নয় যে সমগ্র সৃষ্টি যখন লয় হয়ে যায়, তখন তাঁর মৃত্যু হয়। এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে যে, সূর্য যখন উপস্থিত থাকে, তখন সূর্যের কিরণও উপস্থিত থাকে, কিন্তু সূর্য অস্ত গলে, তাকে দেখা না গেলেও তার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। সূর্য রয়েছে কিন্তু আমরা তাকে দেখতে পাই না। তেমনি, যদিও আমরা আমাদের বর্তমান অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন অবস্থায় ভগবানকে দেখতে পাই না, তবুও তিনি সর্বদাই রয়েছেন এবং তিনি সর্বদাই আমাদের কার্যকলাপ দর্শন করছেন। পরমাত্মারূপে তিনি সাক্ষী এবং উপদেষ্টা (উপদ্রষ্টা অনুমত্তা চ)। তাই শ্রীগুরুদেবের উপদেশ অনুসরণ করার দ্বারা এবং প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন দ্বারা আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, ভগবান আমাদের সম্মুখে উপস্থিত রয়েছেন, এবং তাঁকে দর্শন করার চক্ষু আমাদের না থাকলেও তিনি সব কিছু দর্শন করছেন।

শ্লোক ১২

ন যস্যাদ্যন্তৌ মধ্যং চ স্বঃ পরো নান্তরং বহিঃ ।

বিশ্বস্যামুনি যদ্ যস্মাদ্ বিশ্বং চ তদতং মহৎ ॥ ১২ ॥

ন—না; যস্য—যাঁর (ভগবানের); আদি—আদি; অন্তৌ—অন্ত; মধ্যম্—মধ্য; চ—ও; স্বঃ—নিজের; পরঃ—অন্যের; ন—না; অন্তরম্—অন্তরে; বহিঃ—বাইরে; বিশ্বস্য—সমগ্র জগতের; অমূনি—এই সমস্ত বিচার; যৎ—যাঁর রূপ; যস্মাৎ—যিনি সব কিছুই কারণ তাঁর থেকে; বিশ্বম্—সমগ্র জগৎ; চ—এবং; তৎ—তিনি; স্বতম্—সত্য; মহৎ—অত্যন্ত মহান।

অনুবাদ

ভগবানের আদি নেই, মধ্য নেই এবং অন্ত নেই। তিনি কোন বিশেষ ব্যক্তি বা জাতির নন। তাঁর অন্তর এবং বাহির নেই। এই জড় জগতে আদি এবং অন্ত, আমার এবং তাদের ইত্যাদি যে দ্বৈতভাব দেখা যায়, তা ভগবানের মধ্যে নেই। এই জগৎ যা তাঁর থেকে প্রকাশিত হয়েছে, তা তাঁরই আর একটি রূপ। তাই ভগবান হচ্ছেন পরম সত্য এবং তিনি পূর্ণ ব্রহ্ম।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা ব্রহ্মসংহিতায় (৫/১) করা হয়েছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

“শ্রীকৃষ্ণ বা গোবিন্দ হচ্ছেন পরম ঈশ্বর। তাঁর দেহ সচ্চিদানন্দময়। তিনি সব কিছুই আদি। তাঁর কোন আদি নেই, কারণ তিনি সর্ব-কারণের পরম কারণ।” ভগবানের অস্তিত্বের কোন কারণ নেই, কারণ তিনিই সব কিছুই পরম কারণ। তিনি সব কিছুতে রয়েছেন (ময়া ততমিদং সর্বম্), তিনি সব কিছুতে নিজেকে বিস্তার করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সব কিছু নন। তিনি অচিন্ত্য-ভেদাভেদ যুগপৎভাবে ভিন্ন এবং অভিন্ন। সেই কথা এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জড়-জাগতিক অবস্থায় আমাদের আদি, মধ্য এবং অন্তের একটা ধারণা আছে, কিন্তু ভগবানের ক্ষেত্রে তা নেই। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপে তাঁর প্রকাশ যে বিরাটরূপ, তা তিনি অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন এবং ভগবদ্গীতায় তাঁর বর্ণনা করা হয়েছে। তাই ভগবান যেহেতু সর্বত্র সর্বদা বিরাজমান, তাই তিনিই হচ্ছেন পরম সত্য এবং পরম ব্রহ্ম। তিনি মহিমায় পরিপূর্ণ। ভগবান মহৎ এবং তিনি যে কিভাবে মহান, সেই কথা এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৩

স বিশ্বকায়ঃ পুরুহুত ঈশঃ

সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরজঃ পুরাণঃ ।

ধত্তেহস্য জন্মাদ্যজয়াত্মশক্ত্যা

তাং বিদ্যায়োদস্য নিরীহ আস্তে ॥ ১৩ ॥

সঃ—সেই ভগবান; বিশ্ব-কায়ঃ—ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র রূপ (সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের বাহ্য শরীর); পুরু-হুতঃ—বহু নামে পরিচিত; ঈশঃ—পরম নিয়ন্তা (পূর্ণ শক্তি সমন্বিত); সত্যঃ—পরম সত্য; স্বয়ম্—স্বয়ং; জ্যোতিঃ—স্বয়ংপ্রকাশ; অজঃ—জন্মরহিত, অনাদি; পুরাণঃ—প্রবীণতম; ধত্তে—তিনি অনুষ্ঠান করেন; অস্য—এই ব্রহ্মাণ্ডের; জন্ম-আদি—সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের; অজয়া—তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; আত্ম-শক্ত্যা—তাঁর নিজের শক্তির দ্বারা; তাম্—সেই বহিরঙ্গা জড়া প্রকৃতি; বিদ্যা—তাঁর চিন্ময় শক্তির দ্বারা; উদস্য—ত্যাগ করে; নিরীহঃ—নিষ্কাম বা নিষ্ক্রিয়; আস্তে—তিনি বিরাজ করেন (জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে)।

অনুবাদ

সমগ্র জড় জগৎ পরমতত্ত্ব ভগবানের শরীর, যাঁর অসংখ্য নাম এবং অনন্ত শক্তি রয়েছে। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ, অজ এবং নির্বিকার। তিনি সব কিছুর আদি, কিন্তু তাঁর কোন আদি নেই। যেহেতু তিনি তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তাই মনে হয় যেন তিনি এই বিশ্বের স্রষ্টা, পালক এবং সংহারক। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তিনি তাঁর চিন্ময় শক্তিতে নিষ্ক্রিয় থাকেন এবং জড়া প্রকৃতির কার্যকলাপ তাঁকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না।

তৎপর্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর শিক্ষাষ্টকে বলেছেন, নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তিঃ—ভগবানের বহু নাম রয়েছে এবং সেগুলি ভগবান থেকে অভিন্ন। ভগবানের চিন্ময় সত্তার এটিই বৈশিষ্ট্য। ভগবানের নাম সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে আমরা দেখতে পাই যে, পরম পুরুষের সমস্ত শক্তি তাঁর নামে রয়েছে। ভগবানের লীলা অনন্ত, এবং তাঁর অনন্ত লীলা অনুসারে তাঁর নামও অনন্ত। তিনি মা যশোদার পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং মা দেবকীর পুত্ররূপেও আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং তাই তাঁর নাম যশোদানন্দন এবং দেবকীনন্দন। পরাস্য

শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে—ভগবানের শক্তি অনেক এবং তাই তিনি নানাভাবে লীলাবিলাস করেন। তবুও তাঁর বিশেষ নাম রয়েছে। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কোন্ নাম আমাদের কীর্তন করা উচিত, যেমন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। এমন নয় যে, আমাদের কোন নাম খুঁজতে হবে বা তৈরি করতে হবে। পক্ষান্তরে, আমাদের কেবল শাস্ত্র এবং মহাজনদের অনুসরণ করে তাঁর পবিত্র নাম কীর্তন করতে হবে।

যদিও জড় এবং পরা উভয় প্রকৃতিই ভগবানের, তবুও যতক্ষণ আমরা জড় জগতে থাকি, ততক্ষণ তাঁকে জানা অসম্ভব। কিন্তু আমরা যখন পরা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হই, তখন তাঁকে অনায়াসে জানা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৭/২৩) সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*মায়াং বৃন্দস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি*। যদিও বহিরঙ্গ প্রকৃতি ভগবানেরই, তবুও কেউ যখন বহিরঙ্গ প্রকৃতিতে থাকে (মম মায়া দুরত্যা), তখন ভগবানকে জানা অত্যন্ত কঠিন হয়। কিন্তু, যখন আমরা চিচ্ছক্তিতে আসি, তখন তাঁকে অনায়াসে জানতে পারি। তাই ভগবদ্গীতায় (১৮/৫৫) বলা হয়েছে, *ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ*—কেউ যখন বাস্তবিকভাবে ভগবানকে জানতে চান, তখন তাঁকে অবশ্যই ভক্তির স্তরে বা কৃষ্ণভাবনামৃতের স্তরে আসতে হবে। এই ভক্তির বিবিধ ক্রিয়া রয়েছে (শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ / অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যাত্মনিবেদনম্), এবং ভগবানকে জানতে হলে এই ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। এই জগতে জীব যদিও ভগবানকে ভুলে গিয়ে বলছে যে, ভগবান নেই বা ভগবান মরে গেছে, সেই কথা সত্য নয়। কেউ যখন কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তখন তিনি ভগবানকে জানতে পারেন এবং তার ফলে সুখী হতে পারেন।

শ্লোক ১৪

অথাগ্রে ঋষয়ঃ কৰ্মাণীহন্তেহকৰ্মহেতবে ।

ঈহমানো হি পুরুষঃ প্রায়োহনীহাং প্রপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

অথ—অতএব; অগ্রে—গুরুতে; ঋষয়ঃ—সমস্ত মহাজ্ঞানী ঋষিগণ; কৰ্মাণি—সকাম কর্ম; ঈহন্তে—সম্পাদন করেন; অকর্ম—কর্মফল থেকে মুক্তি; হেতবে—উদ্দেশ্যে; ঈহমানঃ—এই প্রকার কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে; হি—বস্তুতপক্ষে; পুরুষঃ—পুরুষ; প্রায়ঃ—প্রায় সর্বদা; অনীহাম্—কর্ম থেকে মুক্তি; প্রপদ্যতে—প্রাপ্ত হন।

অনুবাদ

অতএব কর্মফল থেকে মানুষকে মুক্ত স্তরে উন্নীত করার জন্য মহান ঋষিরা প্রথমে মানুষদের সকাম কর্মে নিযুক্ত করেন। কারণ শাস্ত্রবিহিত কর্ম অনুষ্ঠান না করলে, মুক্তির বা নৈষ্কর্ম্যের স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৩/৯) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন, যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ—“যজ্ঞরূপে শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে কর্ম অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, তা না হলে কর্ম মানুষকে জড় জগতের বন্ধনে বেঁধে রাখবে।” সাধারণত সকলেই এই জড় জগতে সুখী হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করার প্রতি আসক্ত, কিন্তু যদিও সারা পৃথিবী জুড়ে সুখী হওয়ার জন্য বিচিত্র কর্মের অনুষ্ঠান হচ্ছে, তবুও দুর্ভাগ্যবশত এই প্রকার সকাম কর্মের ফলে কেবল সমস্যারই সৃষ্টি হচ্ছে। তাই উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, সক্রিয় মানুষেরা যেন কৃষ্ণভক্তির কার্যকলাপেই যুক্ত হন। তাকে বলা হয় যজ্ঞ, কারণ তার ফলে তাঁরা ধীরে ধীরে কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত হবেন। যজ্ঞের অর্থ ভগবান শ্রীবিষ্ণু, যজ্ঞপুরুষ বা সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা (ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্)। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন প্রকৃত ভোক্তা এবং তাই আমরা যদি তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কর্ম করি, তা হলে আমরা ধীরে ধীরে জড়-জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি বিরক্ত হব।

নৈমিষারণ্যে ঋষিদের মহতী সভায় শ্রীল সূত গোস্বামী ঘোষণা করেছিলেন—

অতঃ পুণ্ড্রির্জশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ ।

স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥

“হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তাই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, স্থায়ী প্রবণতা অনুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করাই হচ্ছে স্বধর্মের চরম ফল।” (শ্রীমদ্ভাগবত ১/২/১৩) বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারে সকলেরই কর্তব্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসী—এই বর্ণ এবং আশ্রম বিভাগ অনুসারে আচরণ করা। সকলেরই কর্তব্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাতে প্রসন্ন হন (সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্), সেইভাবে কর্ম অনুষ্ঠান করার দ্বারা সিদ্ধি লাভের পথে অগ্রসর হওয়া। অলস হয়ে বসে থাকলে কখনও শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধান করা যায় না; ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে আচরণ করা অবশ্য কর্তব্য, এবং তা হলে ধীরে ধীরে শুদ্ধ ভক্তির স্তরে উন্নীত

হওয়া যাবে। সেই কথা শ্রীমদ্ভাগবতে (১/৫/১২) প্রতিপন্ন হয়েছে—

নৈষ্কৰ্ম্যমপ্যচ্যুতভাববৰ্জিতং

ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্ ।

“আত্ম-উপলব্ধির জ্ঞান সমস্ত জড়-জাগতিক প্রবণতা থেকে মুক্ত হলেও যদি তা অচ্যুত ভগবানের ভাব-বর্জিত হয়, তা হলে তা শোভন হয় না।” জ্ঞানীরা উপদেশ দেয় যে, কোন কিছু না করে কেবল ব্রহ্মের ধ্যানের মাধ্যমে নৈষ্কৰ্ম্যের পস্থা অবলম্বন করার, কিন্তু পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে না পারলে তা কখনই সম্ভব হয় না। যদি কৃষ্ণভাবনার অমৃত না থাকে, তা হলে দার্শনিক, রাজনৈতিক অথবা সামাজিক, সমস্ত কর্মই কর্ম-বন্ধনের কারণ হয়।

মানুষ যতক্ষণ কর্মবন্ধনে আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তাকে বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করতে হয়, যার ফলে মনুষ্য-জীবনের সুযোগ নষ্ট হয়। তাই ভগবদ্গীতায় (৬/৩) কর্মযোগের উপদেশ দেওয়া হয়েছে—

আরুৰুক্ষোৰ্মূনেৰ্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে ।

যোগারুঢ়স্য তসৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥

“অষ্টাঙ্গ যোগ অনুষ্ঠানে যারা নবীন, তাদের পক্ষে নিষ্কাম কর্ম অনুষ্ঠান করাই উৎকৃষ্ট সাধন, আর যাঁরা ইতিমধ্যে যোগারুঢ় হয়েছেন, তাঁদের পক্ষে সমস্ত কর্ম থেকে নিবৃত্তিই উৎকৃষ্ট সাধন।” তা সত্ত্বেও—

কর্মেদ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্ ।

ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমুঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥

“যে মূঢ় ব্যক্তি পঞ্চ-কর্মেদ্রিয় সংযত করেও মনে মনে শব্দ, রস আদি ইন্দ্রিয় বিষয়গুলি স্মরণ করে, সে অবশ্যই নিজেকে বিভ্রান্ত করে, এবং তাকে মিথ্যাচারী ভণ্ড বলা হয়ে থাকে।” (ভগবদ্গীতা ৩/৬) পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার জন্য অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে কর্ম করা উচিত এবং হরিদাস ঠাকুরের মতো মহাপুরুষদের অনুকরণ করে বসে থাকা উচিত নয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এই অনুকরণের নিন্দা করে বলেছেন—

দুষ্ট মন! তুমি কিসের বৈষ্ণব?

প্রতিষ্ঠার তরে,

নির্জনের ঘরে,

তব হরিনাম কেবল কৈতব।

সম্প্রতি মায়াপুরে একজন আফ্রিকান ভক্ত হরিদাস ঠাকুরের অনুকরণ করতে

চেয়েছিল, কিন্তু পনের দিন পর সে আর স্থির থাকতে না পেরে সেখান থেকে চলে গেছে। হঠকারিতা করে হরিদাস ঠাকুরের অনুকরণ করার চেষ্টা করো না। কৃষ্ণভক্তির কার্যকলাপে যুক্ত হও, তা হলে ধীরে ধীরে মুক্তির স্তরে উন্নীত হতে পারবে (মুক্তিহিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ)।

শ্লোক ১৫

ঈহতে ভগবানীশো ন হি তত্র বিসজ্জতে ।

আত্মলাভেন পূর্ণার্থো নাবসীদন্তি যেহনু তম্ ॥ ১৫ ॥

ঈহতে—সৃষ্টি, পালন এবং সংহার-কার্যে রত; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ;
ঈশঃ—পরম ঈশ্বর; ন—না; হি—বস্তুতপক্ষে; তত্র—সেই কার্যকলাপে;
বিসজ্জতে—তিনি লিপ্ত হন; আত্মলাভেন—তঁার নিজের লাভের জন্য; পূর্ণ-
অর্থঃ—যিনি আত্মতৃপ্ত; ন—না; অবসীদন্তি—নিরাশ হন; যে—যিনি; অনু—অনুসরণ
করেন; তম্—ভগবানকে।

অনুবাদ

আত্মলাভপূর্ণ সর্বৈশ্বর্য সমন্বিত ভগবান সৃষ্টি, পালন এবং সংহারকার্য সম্পাদন করেন। এইভাবে কার্য করা সত্ত্বেও তিনি কখনও আসক্ত হন না। তঁার যে সমস্ত ভক্তবৃন্দ তঁার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তঁারাও কখনও বদ্ধ হন না।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৩/৯) উল্লেখ করা হয়েছে, যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ—“যজ্ঞরূপে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে কর্ম করা কর্তব্য, তা না হলে কর্ম জড় জগতে বন্ধনের কারণ হয়।” আমরা যদি কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে কর্ম না করি, তা হলে রেশমগুটির পোকা যেমন তার গুটিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, ঠিক সেইভাবে আমরা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ব। কিভাবে কর্ম করলে আমরা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হব না, সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন। আমাদের প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে যে, আমরা জড়-জাগতিক কার্যকলাপের বন্ধনে আবদ্ধ, এবং যেহেতু আমরা বদ্ধ, তাই আমরা বিভিন্ন প্রকার জীবনে বিভিন্ন প্রকার শরীরে জড়া প্রকৃতির দ্বারা দণ্ডিত হয়ে জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হই। ভগবদ্গীতায় (১৫/৭) ভগবান বলেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ষতি ॥

“এই জড় জগতে বদ্ধ জীবসমূহ সনাতন এবং আমার বিভিন্ন অংশ। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে, তারা মন সহ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে।” জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশ এবং তাই তারা ভগবানেরই অণুসদৃশ রূপ। ভগবান সর্বতোভাবে পূর্ণ এবং তাঁর অণুসদৃশ অংশেরাও তাঁরই গুণে গুণাঙ্কিত, কিন্তু অণুসদৃশ হওয়ার ফলে তারা জড় জগতের আকর্ষণের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই আমাদের ভগবানের উপদেশ অনুসরণ করা উচিত, এবং তা হলে জড়া প্রকৃতির সৃষ্টি, পালন এবং সংহার কার্যে শ্রীকৃষ্ণ যেমন লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হন না, তেমনই আমরাও জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হব না এবং তখন আর আমাদের শোকের কোন কারণ থাকবে না (নাবসীদন্তি যেহনু তম্)। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবদ্গীতায় উপদেশ দিয়েছেন, এবং যে ব্যক্তি তাঁর সেই উপদেশ অনুসরণ করেন, তিনি মুক্ত।

শ্রীকৃষ্ণভক্ত হলেই কেবল শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ পালন করা সম্ভব। কারণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মন্মনা ভব মদ্বক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু— “সর্বদা আমার কথা চিন্তা কর এবং আমার ভক্ত হও। আমার পূজা কর এবং আমাকে প্রণতি নিবেদন কর।” (ভগবদ্গীতা ১৮/৬৫) সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করার অর্থ হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা, কিন্তু দীক্ষিত ভক্ত না হলে তা করা সম্ভব নয়। কেউ যখন ভগবানের ভক্ত হন, তখন তিনি ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনায় যুক্ত হন (মদ্যাজী)। ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানকে এবং শ্রীগুরুদেবকে নিরন্তর প্রণতি নিবেদন করা। ভক্তিস্তরে উন্নীত হওয়ার এটিই হচ্ছে প্রামাণিক বিধি। এই স্তরে উন্নীত হওয়া মাত্রই ভক্ত ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ঙ্গম করার ফলেই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ১৬

তমীহমানং নিরহঙ্কৃতং বুধং

নিরাশিষং পূর্ণমন্যচৌদিতম্ ।

নৃঞং শিক্ষয়ন্তং নিজবত্সংস্থিতং

প্রভুং প্রপদ্যেহখিলধর্মভাবনম্ ॥ ১৬ ॥

তম্—সেই পরমেশ্বর ভগবানকে; ঈহমানম্—যিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য কর্ম করেন; নিরহঙ্কৃতম্—যিনি বন্ধন অথবা লাভের বাসনা রহিত; বুধম্—যিনি পূর্ণরূপে জ্ঞানবান; নিরাশিষম্—যিনি তাঁর কর্মফল ভোগের বাসনা রহিত; পূর্ণম্—পূর্ণ হওয়ার ফলে যাঁর কোন বাসনা চরিতার্থ করার প্রয়োজন হয় না; অনন্য—অন্যের দ্বারা; চোদিতম্—অনুপ্রাণিত; নূন—সমগ্র মানব-সমাজ; শিক্ষয়ন্তম্—(জীবনের প্রকৃত পন্থা) শিক্ষা দেওয়ার জন্য; নিজ-বর্জ—তাঁর নিজের মার্গ; সংস্থিতম্—প্রতিষ্ঠা করার জন্য; প্রভুম্—ভগবানকে; প্রপদ্যে—আমি সকলকে শরণাগত হওয়ার অনুরোধ করি; অখিল-ধর্ম-ভাবনম্—যিনি মানুষের সমস্ত ধর্মের প্রভু।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঠিক একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করলেও, কখনও তিনি তাঁর কর্মের ফল ভোগ করার বাসনা করেন না। তিনি পূর্ণ জ্ঞানময়, সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত, অচ্যুত এবং সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। মানব-সমাজের পরম শিক্ষকরূপে তিনি তাঁর নিজের মার্গ শিক্ষা দেন, এবং এইভাবে তিনি প্রকৃত ধর্মের পন্থা প্রবর্তন করেন। আমি সকলকে তাঁর প্রদর্শিত সেই পন্থা অনুসরণ করতে অনুরোধ করি।

তাৎপর্য

এটিই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সারমর্ম। আমরা সমগ্র মানব-সমাজকে কেবল ভগবদ্গীতার শিক্ষক শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে অনুরোধ করছি। ভগবদ্গীতার যথাযথ উপদেশ অনুসরণ করুন এবং আপনার জীবনকে সার্থক করে তুলুন। এটিই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মূল কথা। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্যোক্তাগণ সকলকে শিক্ষা দিচ্ছেন কিভাবে শ্রীরামচন্দ্রকে অনুসরণ করতে হয়, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে অনুসরণ করতে হয় এবং কিভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অনুসরণ করতে হয়। এই জড় জগতে রাষ্ট্রের জন্য অথবা সৎ সরকারের জন্য নেতার প্রয়োজন। শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং আচরণ করে শিক্ষা দিয়েছেন, কিভাবে সমগ্র মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্য জীবন-যাপন করতে হয়। তিনি রাবণের মতো রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, তিনি তাঁর পিতার আদেশ পালন করেছেন, এবং তিনি সীতাদেবীর আদর্শ পতিরূপে সারা জগতের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এইভাবে একজন আদর্শ রাজারূপে শ্রীরামচন্দ্রের তুলনা হয় না। মানুষ আজও রামরাজ্যের আকাঙ্ক্ষা করে। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান হওয়া

সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শিষ্য এবং ভক্ত অর্জুনকে শিক্ষা দিয়েছেন, কিভাবে জীবন-যাপন করলে চরমে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায় (তাত্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন)। তাঁর সমস্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধার্মিক, সাংস্কৃতিক এবং দার্শনিক শিক্ষা ভগবদ্গীতায় পাওয়া যায়। মানুষের কর্তব্য কেবল নির্ধা সহকারে তাঁর অনুসরণ করা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপেও পরমেশ্বর ভগবান আসেন, নিজে আচরণ করে শুদ্ধ ভক্তির পন্থা শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এইভাবে আমাদের জীবন সার্থক করার জন্য ভগবান ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আমাদের শিক্ষা দেন, এবং তাঁকে অনুসরণ করার জন্য স্বায়ত্ত্ব মনু আমাদের কাছে অনুরোধ করেছেন।

স্বায়ত্ত্ব মনু মানব-সমাজের নেতা, এবং মানব-সমাজকে পরিচালিত করার জন্য তিনি মনুসংহিতা নামক একটি গ্রন্থ প্রদান করেছেন। এখানে তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন ভগবানের বিভিন্ন অবতারদের অনুসরণ করতে। এই সমস্ত অবতারদের বর্ণনা বৈদিক শাস্ত্রে রয়েছে, এবং শ্রীজয়দেব গোস্বামী সংক্ষেপে ভগবানের দশটি প্রধান অবতারের বর্ণনা করেছেন (কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে, কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে, কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ইত্যাদি)। স্বায়ত্ত্ব মনু আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন ভগবানের অবতারদের, বিশেষ করে ভগবদ্গীতা যথাযথ গ্রন্থে কথিত শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসরণ করতে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদর্শিত ভক্তিমার্গের মহিমা বর্ণনা করে এবং তাঁর কার্যকলাপের মহিমা বর্ণনা করে শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলেছেন—

বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-

শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী

কৃপাস্বধিযন্তমহং প্রপদ্যে ॥

“পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি তাঁর নিজের ভক্তিরূপ বৈরাগ্যবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, আমি তাঁর শরণাগত হই। তিনি কৃপার সমুদ্র, তাই তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। আমি তাঁর শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হই।” (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৬/৭৪) এই কলিযুগে মানুষ ভগবানের উপদেশ অনুসরণ করতে পারে না, তাই কিভাবে কৃষ্ণভক্ত হতে হয় তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছেন। কলিযুগের অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য, তিনি সকলকে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে গুরু হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন—

যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ ।

আমার আজ্ঞায় গুরু হ'এগা তার' এই দেশ ॥

“ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিয়েছেন, সকলকে সেই উপদেশ অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে, এবং গুরু হয়ে এই ভূখণ্ডের সকলকে উদ্ধার করার চেষ্টা কর।” (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য ৭/১২৮)। শ্রীরামচন্দ্র, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য একই এবং তা হচ্ছে ভগবানের উপদেশ অনুসরণ করার ফলে কিভাবে সুখী হওয়া যায়, সেই শিক্ষা মানব সমাজকে দান করা।

শ্লোক ১৭

শ্রীশুক উবাচ

ইতি মন্ত্রোপনিষদং ব্যাহরন্তং সমাহিতম্ ।

দৃষ্ট্বাসুরা যাতুধানা জঙ্ঘুমভ্যদ্রবন্ ক্ষুধা ॥ ১৭ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; ইতি—এইভাবে; মন্ত্র-উপনিষদম্—(স্বায়ম্ভুব মনু কর্তৃক উচ্চারিত) বৈদিক মন্ত্র; ব্যাহরন্তম্—শিখিয়েছেন অথবা উচ্চারণ করেছেন; সমাহিতম্—(অবিচলিত চিন্তে) মনকে একাগ্রীভূত করেছেন; দৃষ্ট্বা—(তঁাকে) দর্শন করে; অসুরাঃ—অসুরগণ; যাতুধানাঃ—রাক্ষসেরা; জঙ্ঘুম্—গ্রাস করতে চেয়েছিল; অভ্যদ্রবন্—অত্যন্ত দ্রুতবেগে ধাবিত হয়ে; ক্ষুধা—তাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি সাধনের জন্য।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—স্বায়ম্ভুব মনু যখন উপনিষদ নামক এই বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে সমাধিস্থ হয়েছিলেন, তখন তঁাকে দেখে রাক্ষস এবং অসুরেরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে তঁাকে গ্রাস করতে চেয়েছিল, এবং তাই তারা অতি দ্রুতবেগে তঁার দিকে ধাবিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৮

তাংস্তথাবসিতান্ বীক্ষ্য যজ্ঞঃ সর্বগতো হরিঃ ।

যামৈঃ পরিবৃত্তো দেবৈর্হত্বাশাসৎ ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ১৮ ॥

তান্—সেই অসুর এবং রাক্ষসেরা; তথা—সেইভাবে; অবসিতান্—স্বায়ম্ভুব মনুকে গ্রাস করতে দৃঢ়সঙ্কল্প; বীক্ষ্য—দর্শন করে; যজ্ঞঃ—যজ্ঞ নামক শ্রীবিষ্ণু; সর্ব-গতঃ—যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান; হরিঃ—পরমেশ্বর ভগবান; যামৈঃ—যাম নামক তাঁর পুত্রগণ সহ; পরিবৃতঃ—পরিবেষ্টিত হয়ে; দেবৈঃ—দেবতাদের দ্বারা; হত্বা—(অসুরদের) সংহার করে; অশাসৎ—(ইন্দ্রের পদ গ্রহণ করে) শাসন করেছিলেন; ত্রি-বিষ্টপম্—স্বর্গলোক।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীবিষ্ণু যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, তিনিই যজ্ঞরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। রাক্ষস এবং অসুরদের স্বায়ম্ভুব মনুকে গ্রাস করতে উদ্যত দেখে, তিনি যাম নামক তাঁর পুত্র এবং অন্যান্য দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে, সেই সমস্ত রাক্ষস এবং অসুরদের সংহার করেছিলেন। তারপর তিনি ইন্দ্রের পদ গ্রহণ করে স্বর্গলোক শাসন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র আদি দেবতাদের বিভিন্ন নাম ব্যক্তিগত নাম নয়; সেগুলি বিভিন্ন পদের নাম। এই সম্পর্কে আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, যখন ব্রহ্মা অথবা ইন্দ্রের পদ অধিকার করার উপযুক্ত ব্যক্তি না থাকেন, তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণু সেই পদ গ্রহণ করেন।

শ্লোক ১৯

স্বারোচিষো দ্বিতীয়স্ত মনুরগ্নেঃ সুতোহভবৎ ।

দ্যুমৎসুষেণরোচিষ্মৎ প্রমুখাস্তস্য চাত্মজাঃ ॥ ১৯ ॥

স্বারোচিষঃ—স্বারোচিষ; দ্বিতীয়ঃ—দ্বিতীয়; তু—বস্তুতপক্ষে; মনুঃ—মনু; অগ্নে—অগ্নির; সুতঃ—পুত্র; অভবৎ—হয়েছিলেন; দ্যুমৎ—দ্যুমৎ; সুষেণ—সুষেণ; রোচিষ্মৎ—রোচিষ্মৎ; প্রমুখাঃ—প্রভৃতি; তস্য—তাঁর (স্বারোচিষ) চ—ও; আত্ম-জাঃ—পুত্রগণ।

অনুবাদ

অগ্নির পুত্র স্বারোচিষ দ্বিতীয় মনু হয়েছিলেন। দ্যুমৎ, সুষেণ এবং রোচিষ্মৎ প্রভৃতি তাঁর কয়েকটি পুত্র ছিল।

তাৎপর্য

মম্বন্তরং মনুর্দেবী মনুপুত্রাঃ সুরেশ্বরঃ ।

ঋষয়োহংশাবতারশ্চ হরেঃ ষড়্বিধমুচ্যন্ত ॥

ভগবানের বহু অবতার রয়েছে। মনু, মনুপুত্রাঃ (মনুর পুত্রগণ), স্বর্গের রাজা এবং সপ্তর্ষি, এঁরা সকলেই ভগবানের অংশাবতার। স্বায়ম্ভুব মনুর রাজত্বকালে মনু স্বয়ং, তাঁর পুত্র প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ, দক্ষ কর্তৃক সৃষ্ট দেবতাগণ এবং মরীচি আদি ঋষিগণ ভগবানের অংশাবতার ছিলেন। সেই সময় ভগবানের অবতার যজ্ঞ স্বর্গলোকের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পরবর্তী মনু ছিলেন স্বারোচিষ। পরবর্তী এগারটি শ্লোকে অন্য মনুগণ, ঋষি এবং দেবতাদের বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ২০

তত্রোদ্রো রোচনস্ত্রাসীদ্ দেবাশ্চ তুষিতাদয়ঃ ।

উর্জস্তম্বাদয়ঃ সপ্ত ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ২০ ॥

তত্র—সেই মম্বন্তরে; ইন্দ্রঃ—ইন্দ্র; রোচনঃ—যজ্ঞের পুত্র রোচন; তু—কিন্তু; আসীৎ—হয়েছিলেন; দেবাঃ—দেবতা; চ—ও; তুষিতাদয়ঃ—তুষিত এবং অন্যেরা; উর্জ—উর্জ; স্তম্ব—স্তম্ব; আদয়ঃ—এবং অন্যেরা; সপ্ত—সাত; ঋষয়ঃ—মহর্ষি; ব্রহ্মবাদিনঃ—নিষ্ঠাবান ভক্ত।

অনুবাদ

সেই স্বারোচিষ মম্বন্তরে যজ্ঞের পুত্র রোচন ইন্দ্রের পদ গ্রহণ করেছিলেন। তুষিত আদি মুখ্য দেবতা হয়েছিলেন, এবং উর্জ, স্তম্ব আদি সপ্তর্ষি হয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন ভগবানের নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্ত।

শ্লোক ২১

ঋষেষু বেদশিরসস্তুষিতা নাম পত্ন্যভূৎ ।

তস্যাং যজ্ঞে ততো দেবো বিভুরিত্যভিষিক্ততঃ ॥ ২১ ॥

ঋষেঃ—ঋষি; তু—বস্তুতপক্ষে; বেদশিরসঃ—বেদশিরা; তুষিতা—তুষিতা; নাম—নামক; পত্নী—পত্নী; অভূৎ—উৎপন্ন হয়েছিল; তস্যাম্—তাঁর (গর্ভে); যজ্ঞে—

জন্মগ্রহণ করেছিলেন; ততঃ—তারপর; দেবঃ—ভগবান; বিভূঃ—বিভু; ইতি—এই প্রকার; অভিবিশ্রুতঃ—বিখ্যাত।

অনুবাদ

বিখ্যাত ঋষি বেদশিরার পত্নী তুষিতার গর্ভে বিভূ নামক অবতারের জন্ম হয়েছিল।

শ্লোক ২২

অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনয়ো যে ধৃতব্রতাঃ ।

অশ্বশিক্ষন্ ব্রতং তস্য কৌমারব্রহ্মচারিণঃ ॥ ২২ ॥

অষ্টাশীতি—অষ্টাশি; সহস্রাণি—হাজার; মুনয়ঃ—মহর্ষিগণ; যে—যাঁরা; ধৃত-ব্রতাঃ—ব্রতনিষ্ঠ; অশ্বশিক্ষন্—শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন; ব্রতম্—ব্রত; তস্য—তঁার (বিভু) থেকে; কৌমার—অবিবাহিত; ব্রহ্মচারিণঃ—এবং ব্রহ্মচর্য-পরায়ণ।

অনুবাদ

বিভু আজীবন ব্রহ্মচারী এবং চিরকুমার ছিলেন। অষ্টাশি হাজার মুনি তাঁর কাছে আত্ম-সংযম, তপস্যা আদি আচরণ শিক্ষা গ্রহণ করেন।

শ্লোক ২৩

তৃতীয় উত্তমো নাম প্রিয়ব্রতসুতো মনুঃ ।

পবনঃ সৃঞ্জয়ো যজ্ঞহোত্রাদ্যাস্তৎসুতা নৃপ ॥ ২৩ ॥

তৃতীয়ঃ—তৃতীয়; উত্তমঃ—উত্তম; নাম—নামক; প্রিয়ব্রত—মহারাজ প্রিয়ব্রতের; সুতঃ—পুত্র; মনুঃ—মনু হয়েছিলেন; পবনঃ—পবন; সৃঞ্জয়ঃ—সৃঞ্জয়; যজ্ঞহোত্র-আদ্যাঃ—যজ্ঞহোত্র আদি; তৎসুতাঃ—উত্তমের পুত্র; নৃপ—হে রাজন্।

অনুবাদ

হে রাজন্, তৃতীয় মনু উত্তম ছিলেন মহারাজ প্রিয়ব্রতের পুত্র। পবন, সৃঞ্জয় এবং যজ্ঞহোত্র প্রভৃতি এই মনুর পুত্র ছিলেন।

শ্লোক ২৪

বসিষ্ঠতনয়াঃ সপ্ত ঋষয়ঃ প্রমদাদয়ঃ ।

সত্যা বেদশ্রুতা ভদ্রা দেবা ইন্দ্রস্ত সত্যজিৎ ॥ ২৪ ॥

বসিষ্ঠ-তনয়াঃ—বসিষ্ঠের পুত্রেরা; সপ্ত—সাত; ঋষয়ঃ—ঋষি; প্রমদ-আদয়ঃ—প্রমদ
আদি; সত্যাঃ—সত্যগণ; বেদশ্রুতাঃ—বেদশ্রুতগণ; ভদ্রাঃ—ভদ্রগণ; দেবাঃ—
দেবতা; ইন্দ্রঃ—স্বর্গের রাজা; তু—কিন্তু; সত্যজিৎ—সত্যজিৎ।

অনুবাদ

তৃতীয় মন্বন্তরে প্রমদ আদি বসিষ্ঠের পুত্রেরা সপ্তর্ষি হয়েছিলেন। সত্য, বেদশ্রুত
এবং ভদ্রেরা দেবতা হয়েছিলেন, এবং সত্যজিৎ দেবরাজ ইন্দ্ররূপে মনোনীত
হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৫

ধর্মস্য সূনৃতায়াম্ তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ।

সত্যসেন ইতি খ্যাতো জাতঃ সত্যব্রতৈঃ সহ ॥ ২৫ ॥

ধর্মস্য—ধর্মের দেবতার; সূনৃতায়াম্—সূনৃতা নামক পত্নীর গর্ভে; তু—বস্তুতপক্ষে;
ভগবান্—ভগবান; পুরুষ-উত্তমঃ—পরমেশ্বর ভগবান; সত্যসেনঃ—সত্যসেন; ইতি—
এই প্রকার; খ্যাতঃ—বিখ্যাত; জাতঃ—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; সত্যব্রতৈঃ—
সত্যব্রতগণ; সহ—সহ।

অনুবাদ

এই মন্বন্তরে ধর্মের পত্নী সূনৃতার গর্ভে ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং তিনি
সত্যসেন নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। তিনি সত্যব্রত নামক দেবতাগণ সহ আবির্ভূত
হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৬

সোহনৃতব্রতদুঃশীলানসতো যক্ষরাক্ষসান্ ।

ভূতদ্রুহো ভূতগণাংশ্চাবধীং সত্যজিৎসখঃ ॥ ২৬ ॥

সঃ—তিনি (সত্যসেন); অন্ত-ব্রত—মিথ্যাভাষী; দুঃশীলান্—দুরাচারী; অসতঃ—দুষ্ট; যক্ষ-রাক্ষসান্—যক্ষ এবং রাক্ষসগণ; ভূত-দ্রুহঃ—যারা সর্বদাই অন্য জীবের প্রগতির বিরোধী; ভূত-গণান্—ভূত-প্রেতদের; চ—ও; অবধীৎ—বধ করেছিলেন; সত্যজিৎ-সখঃ—তার সখা সত্যজিৎ সহ।

অনুবাদ

ইন্দের পদে অধিষ্ঠিত সখা সত্যজিৎ সহ সত্যসেন মিথ্যাভাষী, দুরাচারী এবং দুষ্ট প্রাণীপীড়ক যক্ষ, রাক্ষস এবং ভূত-প্রেতদের সংহার করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

চতুর্থ উত্তমভ্রাতা মনুর্নাম্না চ তামসঃ ।

পৃথুঃ খ্যাতির্নরঃ কেতুরিত্যাদ্যা দশ তৎসুতাঃ ॥ ২৭ ॥

চতুর্থ—চতুর্থ মনু; উত্তম-ভ্রাতা—উত্তমের ভ্রাতা; মনুঃ—মনু হয়েছিলেন; নাম্না—নামে বিখ্যাত; চ—ও; তামসঃ—তামস; পৃথুঃ—পৃথু; খ্যাতিঃ—খ্যাতি; নরঃ—নর; কেতুঃ—কেতু; ইতি—এই প্রকার; আদ্যা—ইত্যাদি; দশ—দশ; তৎসুতাঃ—তামস মনুর পুত্রগণ।

অনুবাদ

তৃতীয় মনু উত্তমের ভ্রাতা তামস চতুর্থ মনু হয়েছিলেন। তামসের পৃথু, খ্যাতি, নর, কেতু আদি দশটি পুত্র ছিল।

শ্লোক ২৮

সত্যকা হরয়ো বীরা দেবান্স্রিশিখ ঈশ্বরঃ ।

জ্যোতির্ধামাদয়ঃ সপ্ত ঋষয়স্তামসেহন্তরে ॥ ২৮ ॥

সত্যকাঃ—সত্যকগণ; হরয়ঃ—হরিগণ; বীরাঃ—বীরগণ; দেবাঃ—দেবতাগণ; ত্রিশিখঃ—ত্রিশিখ; ঈশ্বরঃ—স্বর্গের রাজা; জ্যোতির্ধাম-আদয়ঃ—জ্যোতির্ধাম প্রমুখ; সপ্ত—সাত; ঋষয়ঃ—ঋষিগণ; তামসে—তামস মন্বন্তরে; অন্তরে—ভিতরে।

অনুবাদ

তামস মন্বন্তরে সত্যক, হরি এবং বীরগণ দেবতা হয়েছিলেন। ইন্দ্র হয়েছিলেন ত্রিশিখ, এবং জোতির্ধাম আদি সপ্তর্ষি হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৯

দেবা বৈধ্বতয়ো নাম বিধ্বতেস্তনয়া নৃপ ।

নষ্টাঃ কালেন যৈর্বেদা বিধ্বতাঃ স্মেন তেজসা ॥ ২৯ ॥

দেবাঃ—দেবতাগণ; বৈধ্বতয়ঃ—বৈধ্বতিগণ; নাম—নামক; বিধ্বতেঃ—বিধ্বতির; তনয়াঃ—পুত্রগণ; নৃপ—হে রাজন্; নষ্টাঃ—লুপ্ত হয়েছিল; কালেন—কালের প্রভাবে; যৈঃ—যাঁদের দ্বারা; বেদাঃ—বেদ; বিধ্বতাঃ—সুরক্ষিত ছিল; স্মেন—নিজের; তেজসা—শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

হে রাজন্, তামস মন্বন্তরে বিধ্বতির বৈধ্বতি নামক পুত্রগণ দেবতা হয়েছিলেন। কালের প্রভাবে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান নষ্ট হতে থাকলে, সেই সমস্ত দেবতারা তাঁদের তেজের প্রভাবে বেদ রক্ষা করেছিলেন।

তাৎপর্য

তামস মন্বন্তরে দুই প্রকার দেবতা ছিলেন, এবং তাঁদের এক প্রকার বৈধ্বতি নামে পরিচিত। দেবতাদের কর্তব্য হচ্ছে বেদকে রক্ষা করা। দেবতা শব্দটির অর্থ হচ্ছে যারা বেদের তত্ত্বজ্ঞান বহন করেন, আর রক্ষা করে তারা যারা বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান অস্বীকার করে। বেদের প্রামাণিকতা যদি হারিয়ে যায়, তা হলে বিশ্বে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। তাই দেবতা, রাজা এবং রাষ্ট্র-প্রধানদের কর্তব্য হচ্ছে বেদকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা; তা না হলে মানব-সমাজ বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ হয়ে উঠবে এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

শ্লোক ৩০

তত্রাপি জজ্ঞে ভগবান্ হরিণ্যাং হরিমেধসঃ ।

হরিরিত্যাহতো যেন গজেন্দ্রো মোচিতো গ্রহাৎ ॥ ৩০ ॥

তত্রাপি—সেই সময়ে; জজ্ঞে—আবির্ভূত হয়েছিলেন; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; হরিণ্যাম্—হরিণীর গর্ভে; হরিমেধসঃ—হরিমেধা থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন; হরিঃ—হরি; ইতি—এই প্রকার; আহুতঃ—নামক; যেন—যাঁর দ্বারা; গজেन्द्रঃ—গজেन्द्र; মোচিতঃ—মুক্ত হয়েছিল; গ্রহাৎ—কুমিরের মুখ থেকে।

অনুবাদ

এই মন্বন্তরেও ভগবান শ্রীবিষ্ণু হরিমেধার পত্নী হরিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং তিনি হরি নামে খ্যাত হন। তিনি কুমিরের মুখ থেকে গজেन्द्रকে রক্ষা করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

শ্রীরাজোবাচ

বাদরায়ণ এতৎ তে শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্ ।

হরির্যথা গজপতিং গ্রাহগ্রস্তমমুচৎ ॥ ৩১ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; বাদরায়ণে—হে বাদরায়ণ (ব্যাসদেবের) পুত্র; এতৎ—এই; তে—আপনার কাছ থেকে; শ্রোতুম্ ইচ্ছামহে—শুনতে ইচ্ছা করি; বয়ম্—আমরা; হরিঃ—ভগবান শ্রীহরি; যথা—যেভাবে; গজপতিম্—গজরাজ; গ্রাহগ্রস্তম্—যখন কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন; অমুচৎ—উদ্ধার করেছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে বাদরায়ণি, কুমিরের দ্বারা গজেन्द्र আক্রান্ত হলে, শ্রীহরি কিভাবে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন, সেই কথা আমরা বিস্তারিতভাবে শুনতে ইচ্ছা করি।

শ্লোক ৩২

তৎকথাসু মহৎ পুণ্যং ধন্যং স্বস্ত্যয়নং শুভম্ ।

যত্র যত্রোত্তমশ্লোকো ভগবান্ গীয়তে হরিঃ ॥ ৩২ ॥

তৎ-কথাসু—সেই বর্ণনায়; মহৎ—মহান; পুণ্যম্—পুণ্য; ধন্য—মহিমান্বিত;
 স্বস্ত্যয়নম্—মঙ্গলজনক; শুভম্—শুভ; যত্র—যখনই; যত্র—যেখানেই;
 উত্তমশ্লোকঃ—উত্তমশ্লোক নামে প্রসিদ্ধ; ভগবান্—ভগবান; গীয়তে—মহিমান্বিত হন;
 হরিঃ—ভগবান।

অনুবাদ

যে শাস্ত্রে অথবা বর্ণনায় উত্তমশ্লোক ভগবানের মহিমা বর্ণিত হয়, তা নিশ্চিতভাবে
 মহান, শুদ্ধ, ধন্য, মঙ্গলজনক এবং শুভ।

তাৎপর্য

কেবল শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণনা করার মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে
 বিস্তার লাভ করেছে। আমরা বহু গ্রন্থ প্রকাশ করেছি, যেমন প্রতিটি সাড়ে ছয়শ
 পৃষ্ঠা সমন্বিত সাতটি খণ্ডে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ছাড়াও ভগবদ্গীতা এবং
 ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতও প্রকাশ করছি যা আঠারোটি খণ্ডে পূর্ণ
 হবে। যখনই বক্তা এই সমস্ত গ্রন্থ থেকে পাঠ করেন এবং শ্রোতা তা শ্রবণ করেন,
 তার ফলে এক অতি শুভ এবং মঙ্গলজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তাই
 কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যদের, বিশেষ করে সন্ন্যাসীদের অত্যন্ত নিষ্ঠা
 সহকারে কৃষ্ণভাবনামৃতে প্রচার করা কর্তব্য। তার ফলে এক মঙ্গলজনক
 পরিবেশের সৃষ্টি হবে।

শ্লোক ৩৩

শ্রীসূত উবাচ

পরীক্ষিতৈবং স তু বাদরায়ণিঃ

প্রায়োপবিষ্টেন কথাসু চোদিতঃ ।

উবাচ বিপ্রাঃ প্রতিনন্দ্য পার্থিবং

মুদা মুনীনাং সদসি স্ম শৃণ্বতাম্ ॥ ৩৩ ॥

শ্রী-সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; পরীক্ষিতা—পরীক্ষিত মহারাজের
 দ্বারা; এবম্—এইভাবে; সঃ—তিনি; তু—বস্তুতপক্ষে; বাদরায়ণিঃ—শুকদেব
 গোস্বামী; প্রায়-উপবিষ্টেন—আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প্রায়োপবিষ্ট; কথাসু—বাক্যে;
 চোদিতঃ—অনুপ্রাণিত হয়ে; উবাচ—বলেছিলেন; বিপ্রাঃ—হে ব্রাহ্মণগণ;

প্রতিনন্দ্য—তাকে অভিনন্দন জানিয়ে; পার্শ্ববম্—মহারাজ পরীক্ষিৎ; মুদা—মহা আনন্দ সহকারে; মুনীনাম্—মহর্ষিদের; সদসি—সভায়; স্ম—বস্তুতপক্ষে; শৃণ্বতাম্—শ্রবণ করতে ইচ্ছুক।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—হে ব্রাহ্মণগণ, আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প্রায়োপবিষ্ট পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন শুকদেব গোস্বামীকে এইভাবে বলতে অনুরোধ করলেন, তখন মহারাজের বাক্যে অনুপ্রাণিত হয়ে, শুকদেব গোস্বামী রাজাকে অভিনন্দন জানিয়ে শ্রবণেচ্ছু মহর্ষিদের সভায় মহা আনন্দে বলেছিলেন।

ইতি—শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধের ব্রহ্মাণ্ডের প্রশাসক মনুগণ' নামক প্রথম অধ্যায়ের ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য।